বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাই ২০৪১ এর স্মার্ট বাংলাদেশ

হীরেন পণ্ডিত

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণ, উন্নয়ন ও মুক্তির পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও উন্নয়নে তাঁর কোনো বিকল্প নেই। শেখ হাসিনার সততা, নিষ্ঠা, যৌক্তিক মানসিকতা, দৃঢ় মনোবল, প্রজ্ঞা ও অসাধারণ নেতৃত্ব বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে এক ভিন্ন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি এখন বিশ্বখ্যাত নেত্রী হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা স্বপ্নিল গতিতে আধুনিকায়ন হয়েছে। গত এক দশকের ব্যবধানে প্রযুক্তির জাদুর স্পর্শ শহরের পাশাপাশি আবহমান বাংলার প্রত্যন্ড় গ্রামীণ জনপদে রাতারাতি পরিবর্তন করে উন্নত দেশের সমান সুযোগ-সুবিধাযুক্ত লোকালয়ে পরিণত করেছে। মানুষ প্রযুক্তিগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে জীব কে আরো গতিশীল করার চেষ্টা করেছে। বিশ্বে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রযুক্তির বেশির ভাগেরই কোনো না কোনো পর্যায় বাংলাদেশে ব্যবহার হয়ে থাকে। স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার ব্যাপক হারে বাড়ছে। থ্রি-জি ফোর-জি পেরিয়ে ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক যেমন চালু হয়েছে; তেমনি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বঙ্গবন্ধু ১ স্যাটেলাইট এখন মহাকাশে সক্রিয় থেকে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি কাজ বৈদেশিক নির্ভরতা মুক্ত করে সুসম্পন্ন করে চলছে। বাংলাদেশের মতো বিশ্বে আর কোনো উন্নয়নশীল দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে এত স্বল্প সময়ে নিজস্ব পরিকল্পনায় ডিজিটালাইজ হয়েছে।

অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে ত্বরিত সুফলও পেয়েছে। বর্তমানে দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতের আয় ২০০ কোটি ডলার। দেশে ১৮ কোটি ৮৬ লাখ মোবাইল সিম রয়েছে ১৩ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। ২০২৫ সাল শেষে এ আয় ৫০০ কোটি ডলারে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দেশব্যাপী ৪৬টি হাইটেক পার্ক করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মোকাবিলায় বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত দক্ষ মানবসম্পদসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দিয়েছে। শুধু শহরেই নয়, বরং জেলা-উপজেলা সদর ছাড়িয়ে গ্রাম এমনকি প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলেও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দিয়েছে সরকার। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কয়েকটি অনুষঙ্গের ওপর গুরুত্বারোপ করে কাজ করে চলেছে। সে অনুষঙ্গগুলো হলো কানেকটিভিটি ও আইসিটি অবকাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সহযোগী হয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার জানা যুগোপযোগী দক্ষ কর্মী তৈরি করাই প্রধান কাজ। আমাদের দেশের জেনেক্ত ইনফোসিস, সিনেসিস আইটি, ব্রেইনস্টেশন, ইজেরা, বিজেআইটি, প্রাইডসিস, সিসটেক ডিজিটাল, ব্র্যাকআইটি, মাইসফট, মিডিয়াসফট, ইরা ইনফোটেক, নেসেনিয়া, টিকন, এনআইটিএস, বিভিক্রিয়েটিভস, টেকনোভিস্তা, আমরা টেকনোলজিস, বি-ট্র্যাক টেকনোলজিস, এডিএন টেকনোলজিসের মতো আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে বাংলাদেশ। এরমধ্যে ছিলো আইটিইউ অ্যাওয়ার্ড, সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড, গার্টনার এবং এটি কারনিসহ বেশ কিছু সম্মানজনক স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ ভালো করছে এবং যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। যেকোনো দেশের সফলতার মূল বিষয় হলো নেতৃত্ব। বাংলাদেশের তা আছে। অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফরম কোরসেরার বৈশ্বিক দক্ষতা সূচক বা গ্লোবাল স্কিলস ইনডেক্স (জিএসআই) অনুযায়ী, প্রযুক্তিগত দক্ষতার দিক থেকে অপারেটিং সিস্টেম, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো ক্ষেত্রে ভালো করছে বাংলাদেশ। দেশে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা বর্তমানে পুরোপুরি দৃশ্যমান। ১০ বছর আগে কেউ কল্পনাও করেনি ইউনিয়ন পর্যায়ের মানুষ ইন্টারনেট-সেবা পাবে।

২০০৮-এ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ২৪ লাখ, বর্তমানে প্রায় ১৩ কোটি। বাংলাদেশের বিপিও ব্যবসার বাজার গত ১০ বছরে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। ২০০৫ সালে যে ব্যান্ডউইডথের দাম ছিল ৭৭ হাজার টাকা, সরকার এখন তা ৬০ টাকায় নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে বিপিও খাতে প্রায় ৫০ হাজারের বেশি তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হয়েছে। এরই মধ্যে মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইটসহ কয়েকটি বড় প্রাপ্তি বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে অন্যরকম উচ্চতায়।

বাংলাদেশ প্রযুক্তি বিশ্বে অর্জন করে নিয়েছে নিজেদের একটি সম্মানজনক স্থান। বিশেষজ্ঞরা তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক এই উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে আখ্যায়িত করছেন ডিজিটাল নবজাগরণ হিসেবে। দেশে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণার সঙ্গে মানুষের জীবনে এর বড় প্রভাবও দেখা গেছে। বড় পরিবর্তন এনেছে উবার-পাঠাওয়ের মতো রাইড শেয়ারিং সেবা চালু হওয়ায়। এ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান যেমন বেড়েছে, তেমনি অনেকের যাতায়াতেও সুবিধা হয়েছে।

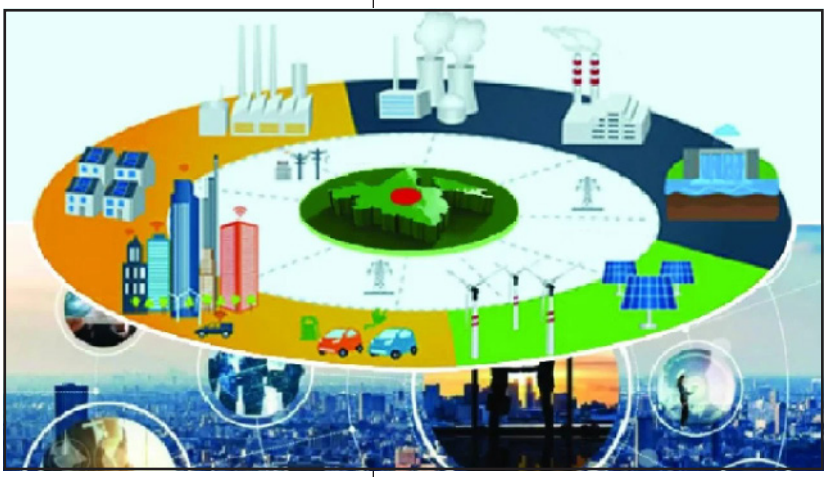

স্মার্টফোন ব্যবহারকারী বাড়ায় নতুন উদ্যোক্তাও সৃষ্টি হয়েছে। সারা দেশের উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কানেকটিভিটি স্থাপনের জন্য বাংলা গভর্নেট ও ইনফো সরকার-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে সরকারের ৫৮ মন্ত্রণালয়, ২২৭ অধিদপ্তর, ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং দেশের সব সরকারি অফিস নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। সরকারি অফিসে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, অ্যাগ্রিকালচার ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন সেন্টার (এআইসিসি) ও টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা যাতে অফিসের বাইওে থেকেও দাপ্তরিক কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদন করতে পারেন, সেজন্য তাদের মাঝে ৫০ হাজার ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিদ্যমান জাতীয় ডেটাসেন্টারটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সেন্টারটির ওয়েবহোস্টিং ক্ষমতা ৭৫০ টেরাবাইটে উন্নীত করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য বিসিসির এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় একটি বিশেষায়িত ল্যাব এবং একটি স্পেশাল সাউন্ড ইফেক্ট ল্যাব স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে।

কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক ও খুলনায় শেখ হাসিনা হাইটেক পার্কের সুফল মানুষ ভোগ করছে। সরকারি উদ্যোগে প্রযুক্তিগত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সরকার এক হাজারের বেশি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছে। ২০০ বছরেরও অধিককাল ধরে প্রচলিত বিচারিক কার্যক্রমের ডিজিটালাইজেশন করেছে সরকার। সাইবার হয়রানি রোধে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এই কর্মসূচির আওতায় একটি হেল্পলাইনও চালু করা হয়েছে। পাঠাও-উবারের মতো স্টার্টআপ চালু হয়েছে। এরই মধ্যে শতাধিক স্টার্টআপ কোম্পানিকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। সরকার কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, অধিকতর উন্নত জনসেবা প্রদানের জন্য প্রশাসনের সর্বস্তরে ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা করেছে।

সাংবাদিকতায় প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে বেশ ভালোভাবেই। নিউজের জন্য এখন আর পরদিনের ছাপা পত্রিকার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। প্রতি মুহূর্তে পত্রিকা-টিভির অনলাইন নিউজ পোর্টালের মাধ্যমে সারা বিশ্বের তাৎক্ষণিক ঘটনাবলি ও তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। করোনাকালীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রযুক্তির ব্যবহারে চরম উৎকর্ষতা দেখাতে পেরেছে আর শিক্ষাব্যবস্থার পুরোটাই প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যও অনলাইনমুখী হচ্ছে। গড়ে উঠেছে এফ-কমার্স বা ফেসবুকভিত্তিক ব্যবসা।

এর বাইরে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের একটি বড় অংশ ফ্রিল্যান্সার। দেশে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সার রয়েছেন। এর বাইরে রয়েছেন সফটওয়্যার খাতের উদ্যোক্তারা। এ খাতে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি আয় আসছে। নারীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি আরেক বড় অগ্রগতি। এ ছাড়া ই-কমার্স ও এফ-কমার্স খাত দেশে প্রসারিত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নারী উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি বাড়ছে।

দেশে প্রায় ৬০ হাজার ফেসবুক পেজে কেনাকাটা চলছে। এরমধ্যে ২২ হাজার পেজ চালাচ্ছেন নারীরা। ফেসবুককে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে স্বল্প পুঁজিতেই উদ্যোক্তা হয়ে উঠছেন নারীরা। বছরে ই-কমার্স খাতে লেনদেন হয় ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। দেশের তথ্যপ্রযুক্তিতে অন্যতম একটি খাত বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা বিপিও। খাতটিতে কাজ করছেন লক্ষাধিক তরুণ-তরুণী।

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় নেপথ্য নায়ক ও নিঃশব্দে ঘটে যাওয়া আইসিটি বিপ্লবের স্থপতি প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। ১৫ বছর ধরে দেশের সব মানুষকে ইন্টারনেটের আওতায় নিয়ে আসা, তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং সরকারের ডিজিটাল সেবাগুলো মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আইসিটি শিল্পে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন, সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশকে ডিজিটাল জগতে নিয়ে যাওয়ায় বিশেষ অবদান রাখছেন। আমাদের দেশে প্রযুক্তির ব্যবহার ও নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বর্তমান ধারা বজায় থাকলে আগামী এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছে যাবে।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পঞ্চমবারের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার শপথ নিয়েছেন। আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের শ্লোগান ছিলো 'দিন বদলের সনদ', ২০১৪ সালের 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ', ২০১৮ সালের ইশতেহারের শিরোনাম ছিলো 'সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'। ২১টি বিশেষ অঙ্গীকারে ছিলো এটিতে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'স্মার্ট বাংলাদেশ : উন্নয়ন দৃশ্যমান, বাড়বে এবার কর্মসংস্থান' স্লোগানে নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের ঘোষিত ইশতেহারে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা, গণতান্ত্রিক চর্চার প্রসার, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, আর্থিক খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা সুলভ করা, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলাসহ মোট ১১টি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইশতেহারে আরো বলা হয়েছে, সরকার কৃষির জন্য সহায়তা ও ভর্তুকি তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। ব্যবহারযোগ্য কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্য ও সহজপ্রাপ্য করা হবে। কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখা হবে। বাণিজ্যিক কৃষি, জৈবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং রোবোটিকস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ন্যানো টেকনোলজিসহ গ্রামীণ অকৃষিজ খাতের উন্নয়ন ও বিশ্বায়ন মোকাবেলায় উপযুক্ত কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে।

কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষি গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ অব্যাহত থাকবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ২০২৮ সালের মধ্যে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা ১ দশমিক ৫ গুণ বৃদ্ধি করা হবে। বাণিজ্যিক দুগ্ধ, পোলট্রি ও মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সহজ শর্তে ঋণ, প্রয়োজনীয় ভর্তুকি, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও নীতিগত সহায়তা দেয়ার কথাও বলা হয়েছে।

জনগণের বিবেচনায় ১৫ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের 'রোল মডেল' হয়েছে, নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ করোনার কারণে ২০২৬ সাল পর্যন্ত এলডিসির সুবিধাগুলো বজায় রাখার জন্যই বাংলাদেশ এ অনুরোধ করে। অনেক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, পদ্মা বহুমুখী সেতু, ঢাকা মেট্রোরেল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল চালু করা, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কর্ণফুলী টানেল, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, মাতারবাড়ী ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প, পায়রা বন্দর, পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প, রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প, বাঁশখালী বিদ্যুৎ প্রকল্প।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সব ধরনের শোষণ, বঞ্চনা, অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে সোচ্চার, সুরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে আসছে। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর দল ক্ষমতায় থাকলে মানুষের ভাগ্যের উন্নতি হয়। এই দলের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৭৪ বছরের ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সাহসী কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে এবং তিনি জনগণের কল্যাণে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন।

শেখ হাসিনার অদম্য শক্তি, সাহস, মনোবল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিশ্ব বিস্মিত। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৯তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ২০তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। এদিকে বাংলাদেশকে ২০২৬ সালে মধ্যম আয়ের দেশ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। এর বড় প্রমাণ বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গত কয়েক বছরে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। বর্তমানে মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৭৯৫ মার্কিন ডলার।

আওয়ামী লীগ আমার গ্রাম আমার শহর, গ্রামে সব নাগরিক সুযোগ-সুবিধা এবং আমার বাড়ি আমার খামারের মাধ্যমে জনগণকে সমর্থন দিতে সক্ষম হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক-বাহক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাত ধরেই ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ-মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে। যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট সেবা সম্প্রসারণের ফলে গ্রামীণ উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থা গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। কৃষি উপকরণ সহজলভ্য ও কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে, গ্রামীণ চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে। কৃষিজ ও অকৃষিজ উভয় ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড বহুগুণ সম্প্রসারিত হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাফল্যে ভর করেই দূরদর্শী, প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দেন। আমরা সবাই জানি যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে ডিজিটাল বাংলাদেশ ছিল সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘোষণা। ঠিক একইভাবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণাও ইতিমধ্যে মানুষের মনে শুধু আলোড়ন সৃষ্টিই করেনি, নব আশার সঞ্চার করেছে। প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটির ওপর ভিত্তি করে সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে

ইতিমধ্যেই ব্যাপক পরিসরে কাজ করছে।

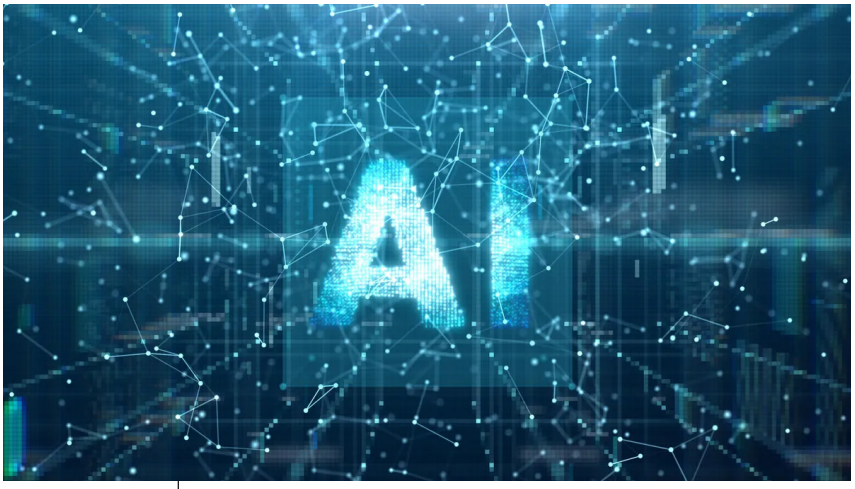

স্মার্ট বাংলাদেশ কতটা আধুনিক একটি কর্মসূচি, তা এর চার স্তম্ভের লক্ষ্য থেকেই অনুধাবন করা যায়। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা স্বল্প, মধ্যর্ম এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমেই সাজানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের সুপারিশ পেয়েছে। ন্যায্য, সত্য ও মানুষের কল্যাণের পক্ষে সোচ্চার দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বিনির্মাণের যে ভিশন ঘোষণা করেছেন, তাতে শক্তি, সাহস, সক্ষমতা ও প্রেরণা জুগিয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। নতুন করে আবারও ক্ষমতাসীন হলে ২০৪১-এর আগেই বাংলাদেশ হবে বুদ্ধিদীপ্ত, উদ্ভাবনী ও সমৃদ্ধ উচ্চ অর্থনীতির আধুনিক স্মার্ট বাংলাদেশ।

'স্মার্ট বাংলাদেশের মূল সারমর্ম হবে- দেশের প্রতিটি নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে, উইথ স্মার্ট ইকোনমি। অর্থাৎ ইকোনমির সমস্ত কার্যক্রম আমরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে করব। স্মার্ট গভর্নমেন্ট; ইতোমধ্যে আমরা অনেকটা করে ফেলেছি। সেটাও করে ফেলব। আর আমাদের সমস্ত সমাজটাই হবে স্মার্ট সোসাইটি।

সেই বিবেচনায় ২০২১ থেকে ৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও প্রণয়ন শুরু হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ ২১ থেকে ৪১ কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নটা হবে তার একটা কাঠামো পরিকল্পনা বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রণয়ন করেছে। যা জনগণের জন্য অন্যতম আর্শীবাদ বয়ে আনবে।

অন্যদিকে ২০৪১ সালেই শেষ নয়, ২১০০ সালেও এই বঙ্গীয় ব-দ্বীপ যেন জলবায়ুর অভিঘাত থেকে রক্ষা পায়, দেশ উন্নত হয়, দেশের মানুষ যাতে 'সুন্দর, সুস্থ এবং স্মার্টলি' বাঁচতে পারে, সেজন্য ডেল্টা প্ল্যান করে দেওয়ার কথা বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

স্মার্ট বাংলাদেশ কী এবং কীভাবে তা অর্জিত হতে পারে সেটি ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, আগামী ২০৪১ সাল নাগাদ আমাদের দেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা এই শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত, কেননা উন্নত বিশ্বের দেশগুলো তো এরই মধ্যে স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হয়েছে, এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশও স্মার্ট দেশে রূপান্তরের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তাই দেশের উন্নতি এবং অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হলে দেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যেতে হবে। আগামীতে যেসব দেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে এগিয়ে থাকবে তারাই ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থা তৈরি করতে পারবে।

দেড় যুগ আগে বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশের মতোই ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল, যার শতভাগ সফলতা এখন দৃশ্যমান। বিগত করোনা মহামারির বিস্তর ক্ষয়-ক্ষতি বাংলাদেশ অনেক উন্নত দেশের চেয়েও সুন্দরভাবে সামাল দিতে পেরেছে তার অনেক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে দেশের ডিজিটালাইজেশন।

ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি বড় সুবিধা হচ্ছে, দেশের সব কিছু উন্নত বিশ্বের মতো প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলা, যাকে এককথায় ডিজিটালাইজেশন বলা হয়ে থাকে, বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিনির্ভর ডকুমেন্টের গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি, একসময় আমাদের দেশের পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা অনেক দেশেই কম ছিল, সেই পাসপোর্ট যখন সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর ই-পাসপোর্টে রূপান্তর করা হলো, তখন এর গ্রহণযোগ্যতাও অনেক গুণ বেড়ে গেল।

ডিজিটাল বাংলাদেশের বদৌলতে সরকার দেশের সব নাগরিকের জন্য ন্যাশনাল আইডি (এনআইডি) চালু করেছে, যেহেতু এনআইডি সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর একটি ডকুমেন্ট, তাই এর গ্রহণযোগ্যতা শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, দেশের বাইরেও অনেক বেশি, এখানকার সরকারি অফিস থেকে এনআইডির কপি চেয়ে (যে কোনো প্রয়োজনেই চাওয়া হয়) এবং সেই কপি জমা দেওয়ার কারণে অনেক আনুষঙ্গিক কাগজপত্র জমা দিতে হয় না অথচ এরাই আগে আমাদের দেশের কোনো কাগজপত্রই খুব সহজে বিশ্বাস করতে চাইত না, এখানেই দৃশ্যমান হয় ডিজিটাল বাংলাদেশের গুরুত্ব এবং সুবিধা।

২০০৮ সালে যুগ আগে বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশের মতোই ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল, যার শতভাগ সফলতা এখন দৃশ্যমান। বিগত করোনা মহামারির বিস্তর ক্ষয়-ক্ষতি বাংলাদেশ অনেক উন্নত দেশের চেয়েও সুন্দরভাবে সামাল দিতে পেরেছে তার অনেক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে দেশের ডিজিটালাইজেশন।

ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি বড় সুবিধা হচ্ছে, দেশের সব কিছু উন্নত বিশ্বের মতো প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলা, যাকে এককথায় ডিজিটালাইজেশন বলা হয়ে থাকে, বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিনির্ভর ডকুমেন্টের গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি, একসময় আমাদের দেশের পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা অনেক দেশেই কম ছিল, সেই পাসপোর্ট যখন সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর ই-পাসপোর্টে রূপান্তর করা হলো, তখন এর গ্রহণযোগ্যতাও অনেক গুণ বেড়েছে।

আবার বর্তমান যুগে সব কিছু ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর না করতে পারলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কী মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাত। দেড় যুগ আগে ডিজিটাল বাংলাদেশের সূচনা হলেও দেশের ব্যাংকিং খাত সেভাবে প্রযুক্তিনির্ভর

হয়ে উঠতে পারেনি কিংবা প্রযুক্তি নির্ভর হলেও রয়েছে সমন্বয়হীনতা। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যাংক ভিন্ন রকম প্রযুক্তির ব্যবহার করছে ঠিকই, কিন্তু তাতে প্রকৃত ডিজিটাল ব্যাংকিং থেকে আমাদেও দেশের ব্যাংকিং খাত অনেক দূরে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের হাত ধরে দেশকে এগিয়ে নিতে হলে বাংলাদেশকে প্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক উন্নত হতে হবে এবং সেই উদ্যোগ সফল করতে হলে স্মার্ট বাংলাদেশ এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী এক কর্মপরিকল্পনা। অনেকেই হয়তো বলার চেষ্টা করবেন যে দেশকে প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য স্মার্ট বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল গ্রহণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে প্রয়োজন স্মার্ট সিটিজেন। ভবিষ্যতে যাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকবে তারাই ভালো কাজ পাবে। যাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকবে না, তারা কাজ হারাবে। তবে সবাই কাজের অযোগ্য হয়ে যাবে তা মোটেই নয়। অনেক বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বর্তমানের চেয়ে ৫-১০ গুণও বাড়তে পারে। ভবিষ্যতের এই অদম্য অগ্রযাত্রায় সবাইকে সামিল হতে হবে।

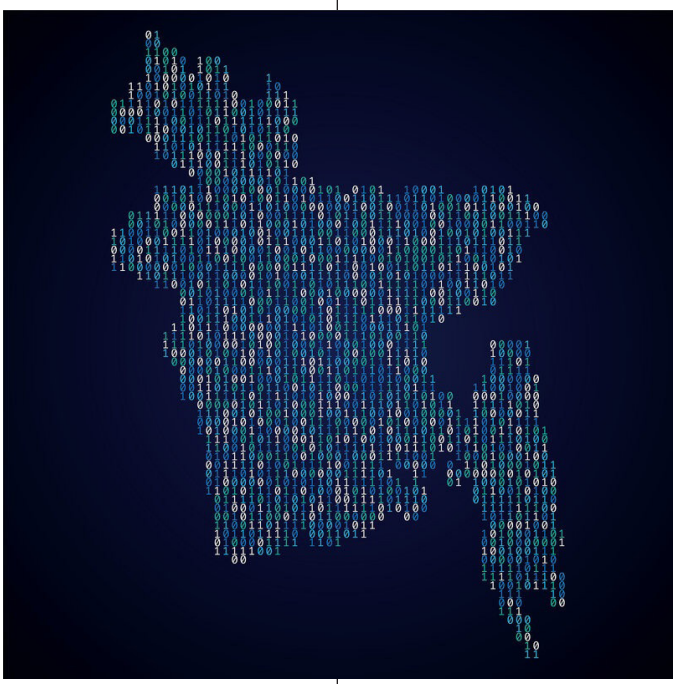

উন্নত বিশ্বপ্রযুক্তি আজ যে পর্যায়ে এসেছে আমাদের দেশে তার কাজটা শুরু হয়েছিল আজ থেকে তিন দশক আগে। তারপরও এখন দেশ যে শতভাগ প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে গেছে এমন দাবি করার সময় এখনো আসেনি। সেই বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সঠিক সময়েই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এখন প্রয়োজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই উদ্যোগ সফলভাবে এগিয়ে নেওয়া।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় এক কোটি মানুষ বিদেশে কর্মরত আছেন। যাদের ৮৮ শতাংশই কোন ধরনের প্রশিক্ষণ ছাড়া অর্থাৎ প্রায় ৭৬ লাখ প্রবাসীর কাজের প্রশিক্ষণ নেই। আর বাকি ১২ শতাংশ প্রবাসী কারিগরি শিক্ষা, ভাষা, কম্পিউটার ও ড্রাইভিং-এ চারটির কোন একটির ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রবাসীদের মধ্যে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ডিগ্রিধারীর সংখ্যা খুবই কম।

প্রযুক্তির নানা বিকাশ, শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির রাজত্ব গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কাঠামোয় এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। এখন বিশ্বব্যাপী কারিগরি জ্ঞানের কদর খুব সহজেই চোখে পড়ে। জনশক্তি খাত থেকে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে বর্তমানে তা আরও কয়েকগুণ বাড়ানো সম্ভব।

বিশ্বে এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা সামনে আসছে। এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা মাথায় রেখেই আমাদের দক্ষ কর্মজ্ঞান সম্পন্ন লোকবল সৃষ্টি করছে সরকার। দেশের মানুষকে কারিগরি ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে দক্ষ করে তুলতে হবে। যাতে তারা পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে। দক্ষ জনশক্তি আমাদের দেশের উন্নয়ন খাতে অবদান রাখতে পারবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করছেন। আমরা বিদেশের শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে হবে।

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে প্রয়োজন শিক্ষা। এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণেই বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকতে উচ্চশিক্ষাকে নতুন করে সাজানোর কথা বলা হয়েছে। দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনপূর্বক যথাযথভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন করে সাজানো প্রয়োজন এবং তা শুরু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ক্রমাগত বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম চারটি রফতানি, আমদানি, বিনিয়োগ ও সাময়িক অভিবাসন। বাংলাদেশের আমদানির পরিমাণ রফতানির চেয়ে অনেক বেশি। তাই দেশে বিনিয়োগ (বিদেশী) বৃদ্ধি ও জনশক্তি রফতানি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার প্রধান উপায়। বিদেশী বিনিয়োগ দেশে বাড়বে তখনই, যখন দেশে থাকবে পর্যাপ্ত উপকরণ, যেমন খনি বা জমি, পুঁজি কিংবা জনশক্তি। অদক্ষ জনশক্তি বিদেশী বিনিয়োগ ততটা উৎসাহিত করে না। এক্ষেত্রে শুধু শ্রমনির্ভর খাতে বিনিয়োগ হবে। বাংলাদেশ কেবল একটি পণ্যই রফতানি করছে। অথচ যেসব দেশে শ্রমিকের দক্ষতা বেশি, সেসব দেশে বাড়ে বিদেশী বিনিয়োগ। জনশক্তি রফতানির ক্ষেত্রেও একই চিত্র। বিদেশে শ্রমিক প্রয়োজন। তবে ক্রমাগত দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বাড়ছে। অদক্ষ শ্রমিকের চেয়ে দক্ষ শ্রমিক প্রায় ১০ গুণ বেশি আয় করেন। আর শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে শিক্ষার মানের ওপর। তাই শিক্ষার মান পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। গতানুগতিক চিন্তার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না।

বিশ্ব সভ্যতাকে নতুন মাত্রা দিচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রক্রিয়া ও সম্ভাব্যতা নিয়ে ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। আলোচনা হচ্ছে আমাদের দেশেও। এই আলোচনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা তৈরি বাংলাদেশকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দানের উপযোগী করে গড়ে তুলে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা নিরলস কাজ করছেন।

আমরা জানি, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হচ্ছে ফিউশন অব ফিজিক্যাল, ডিজিটাল এবং বায়োলজিকাল স্ফেয়ার। এখানে ফিজিক্যাল হচ্ছে

হিউমেন, বায়োলজিকাল হচ্ছে প্রকৃতি এবং ডিজিটাল হচ্ছে টেকনোলজি। এই তিনটিকে আলাদা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে কী হচ্ছে? সমাজে কী ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে? এর ফলে ইন্টেলেকচুয়ালাইজেশন হচ্ছে, হিউমেন মেশিন ইন্টারফেস হচ্ছে এবং রিয়েলটি এবং ভার্চুয়ালিটি এক হয়ে যাচ্ছে। আমাদেরকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করতে হলে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, ফিজিক্যাল ইন্টেলিজেন্স, সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স, কনটেস্ট ইন্টেলিজেন্সর মতো বিষয়গুলো মাথায় প্রবেশ করাতে হবে।

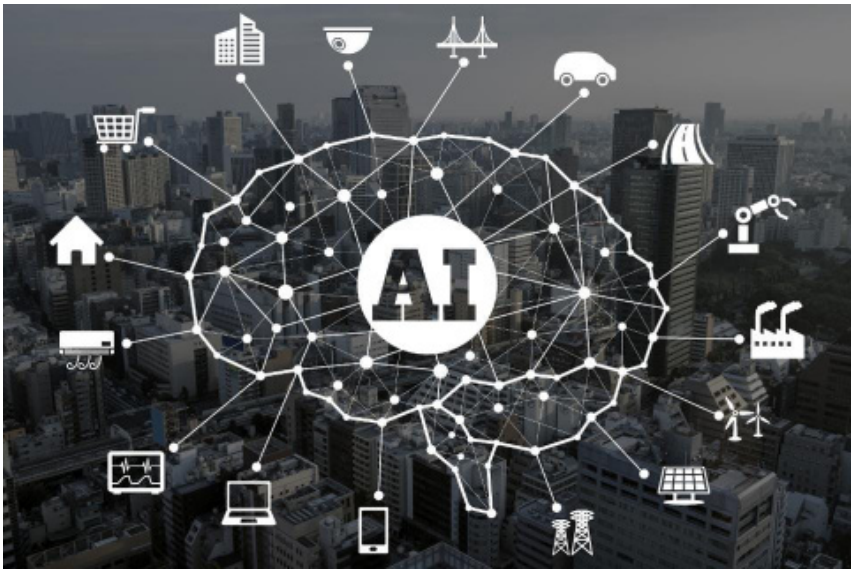

তাহলে ভবিষ্যতে আমরা সবাইকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করতে পারব। তবে ভবিষ্যতে কী কী কাজ তৈরি হবে সেটা অজানা। এই অজানা ভবিষ্যতের জন্য প্রজন্মকে তৈরি করতে আমরা আমাদের কয়েকটা বিষয়ে কাজ পারি। সভ্যতা পরিবর্তনের শক্তিশালী উপাদান হলো তথ্য। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে উদগ্রীব ছিল।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিগত আলোড়ন সর্বত্র বিরাজমান। এ বিপ্লব চিন্তার জগতে, পণ্য উৎপাদনে ও সেবা প্রদানে বিশাল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। মানুষের জীবনধারা ও পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি ব্যাপকভাবে বদলে দিচ্ছে। জৈবিক, পার্থিব ও ডিজিটাল জগতের মধ্যেকার পার্থক্যের দেয়ালে চির ধরিয়েছে।

আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিঙ, ইন্টারনেট অব থিংস, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, থ্রিডি প্রিন্টিং, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও অন্যান্য প্রযুক্তি মিলেই এ বিপ্লব। এ বিপ্লবের ব্যাপকতা, প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিকতা ও এ সংশ্লিষ্ট জটিল ব্যবস্থা বিশ্বের সরকারগুলোর সক্ষমতাকে বড় ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীনও করেছে।

বিশেষত যখন সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা তথা এসডিজির আলোকে 'কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে' সবাইকে নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। টেকসই উন্নয়ন, বৈষম্য হ্রাস, নিরাপদ কর্ম এবং দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন এসডিজি বাস্তবায়ন ও অর্জনের মূল চ্যালেঞ্জ। শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরি ও অনলাইন প্রযুক্তিগত ডিজিটাল জ্ঞান তৈরি করছে নানা কর্মসংস্থান। শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো সহজ করে তুলতে এটুআইয়ের সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে 'কিশোর বাতায়ন' ও 'শিক্ষক বাতায়ন'-এর মতো প্ল্যাটফর্ম।

দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে প্রযুক্তি যেমন করে সহজলভ্য হয়েছে, তেমনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছের প্রযুক্তিনির্ভর সেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সব নাগরিক সেবা ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে প্রযুক্তি হয়ে উঠেছে এক বিশ্বস্ত মাধ্যম। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মোকাবেলায় বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দিয়েছে। বাংলাদেশ আগামী পাঁচ বছরে জাতিসংঘের ই-গভর্ন্যান্স উন্নয়ন সূচকে সেরা ৫০টি দেশের তালিকায় থাকার চেষ্টা করছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের ৫টি উদ্যোগ আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সেগুলো হলো ডিজিটাল সেন্টার, সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড, অ্যাম্পেথি ট্রেনিং, টিসিভি (টাইম, কস্ট ও ভিজিট) ও এসডিজি ট্রেকার। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তরুণরা গড়ে তুলছে ছোট-বড় আইটি ফার্ম, ই-কমার্স সাইট, অ্যাপভিত্তিক সেবাসহ নানা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইটসহ কয়েকটি বড় প্রাপ্তি বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়।

ডাটা প্রটেকশন আইনটি পাস হলে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারসহ বিদেশি কর্তৃপক্ষগুলো এ দেশে অফিস করতে এবং দেশের তথ্য দেশের ডাটা সেন্টারে রাখতে বাধ্য হবে। মানুষের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা তৈরি বাংলাদেশকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্ব দানের উপযোগী করে গড়ে তুলে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে কাজ চলছে। মানুষের তথ্য প্রসারের তীব্র বাসনাকে গতিময়তা দেয় টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার, টেলিভিশন এসবের আবিষ্কার। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে কম্পিউটার ও পরবর্তীতে তারবিহীন নানা প্রযুক্তি তথ্য সংরক্ষণ ও বিস্তারে বিপ্লবের সূচনা করে। আজকের এই ডটকমের যুগে আক্ষরিক অর্থেই সারা বিশ্ব একটি 'গ্লোবাল ভিলেজ' এ পরিণত হয়েছে।

রিস্কিলিং, আপস্কিলিং ও ডিস্কিলিং পদ্ধতির বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। বিদ্যমান শিখন কার্যক্রমের সঙ্গে ডিজিটালনির্ভর অন্যান্য ব্যবস্থা, যেমন ই-লার্নিং ও অনলাইন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশ জনশক্তি রফতানিতে এখনো যেমন অদক্ষ ক্যাটাগরিতে রয়েছে, তেমনি দেশে দক্ষ জনবলের অভাবে বিদেশ থেকে লোক আনতে হচ্ছে। এজন্য জার্মানি, জাপান, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের কারিগরি শিক্ষার মডেল আমাদের অনুসরণ করতে হবে। জার্মানিতে কারিগরি শিক্ষার হার ৭৩ শতাংশ। দেশে এ শিক্ষার হার অন্তত ৬০ শতাংশে উন্নীত করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন ও উত্তর কোরিয়ার মতো দেশের উন্নতির মূলে রয়েছে কারিগরি শিক্ষা।

হীরেন পণ্ডিত, প্রাবন্ধিক ও গবেষক
ফিডবাক: *hiren.bnnrc@gmail.com*
ছবি: ইন্টারনেট